ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1249-1258
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.127

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আসামের সাংস্কৃতিক কর্মীদের অবদান

পুনম মুখার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.05.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 1971, during the Liberation War, a significant influx of refugees arrived in the northeastern states of India. Assam became a sanctuary for these refugees. The people of Assam, across all strata of society, came forward to help these helpless individuals who had fled their homeland. Notably, the cultural activists of Assam took special initiatives. Playwrights wrote plays cantered on the Liberation War. The poetry and stories of that time depicted the Liberation War and the life crises of refugees. Self-taught folk poets made the Liberation War the theme of their works. The transformation of East Pakistan into a nation called Bangladesh is a moment of history marked by immense sacrifices and selfless acts of devotion. The memories of the Liberation War remain indelible in fostering unity and secular consciousness. Bangladeshi poet Dilwar wrote a poem dedicated to Assamese poet Atin Das. The literature created in Assam during 1971 about the Liberation War was not solely a product of imagination. Poets and cultural activists primarily drew inspiration from their firsthand accounts of the arriving refugees to create their works.

Keywords: Bangladesh, Liberation war, Migration, play, story poet, society, social workers

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত হয়েছিল দুটি দেশে ভারত ও পাকিস্তান। দেশভাগের এই ক্ষত ভোলার নয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হলেও সংস্কৃতিগতভাবে দুটি দেশের বহু প্রদেশের মানুষ ছিল যুক্ত। দেশভাগের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দুই তরফে দুই প্রদেশ। মাঝখানে দুই হাজার বর্গ কিলোমিটারের দূরত্ব। পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল বেশি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মনোভাব ছিল বৈষম্যমূলক। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর নিপীড়নও শুরু হয়। মহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার এক সভায় ঘোষণা করেন, উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হন বীর বাঙালি সন্তানরা। সামরিক বাহিনীতেও ছিল বৈষম্য। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ছিল বাঙালি। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত টালমাটাল অবস্থার সম্মুখীন হয়।[১] ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে, পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো দল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের ‘পাকিস্তান পিপলস পার্টি’, পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধাতের সমালোচনা করে, বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের ডাক দেন।

মুক্তিযুদ্ধ কোনও সামরিক উত্তেজনার ফসল নয়, বরং তার পিছনে রয়েছে দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। মনে রাখতে হবে দীর্ঘ নয় মাস কালব্যাপী এই যুদ্ধে বহু মানুষ মৃত্যু বরণ করেছেন। বহু মানুষ হয়েছেন ঘরছাড়া। যুদ্ধকালীন সময়ে শরণার্থী সমস্যা নতুন কিছু নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা ছিল ভিন্ন। পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, নিজের দেশের পূর্ব অংশের সাধারণ মানুষদের উপর এক প্রচণ্ড দমনমূলক, প্রতিহিংসা পরায়ণ মানসিকতা পোষণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৃপ্ত হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে এক নারকীয় গণহত্যা চালানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর। ১৯৪৭-এর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকদের মতে হিন্দু শাসকদের মদত ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা নষ্ট করার পক্ষে।[২]

হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের উপরেও অত্যাচারের আঘাত নেমে আসে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ সবথেকে বেশি সীমানা ভাগ করে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সঙ্গে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি বলতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরামের অংশ বিশেষের কথা মনে আসে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের শরণার্থী আগমনের কথা এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির দিকে তাকালেই মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক যে স্মৃতির রেখার স্রোত ভেসে আসে, তার মূল যোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে ২৫ মার্চের কালো রাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূলত ২৫ মার্চের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীরা ভারতের পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী বাঙ্গালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করেছিল। ১৯৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধে ভারত মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় এক কোটি শরণার্থী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। মূলত ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই অভিবাসন ঘটে। আসাম রাজ্যের শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির মতো অঞ্চলগুলির মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক শরণার্থীজনিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি গোটা ভারতে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

১৯৭১ সালের প্রথম পর্ব থেকেই শরণার্থী আগমন শুরু হলেও ২৫ মার্চের পর থেকে প্রচুর শরণার্থী আসতে থাকে। প্রথম পর্বে সরকারি সাহায্যের পূর্বেই, সাধারণ মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পাড়াভিত্তিক ক্লাব, প্রত্যেকটি এলাকার সামর্থবান ব্যক্তি শরণার্থীদের আশ্রয়, খাদ্যের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন। সামাজিক,অর্থনৈতিক স্তরে সাহায্যের পাশাপাশি আসামের সাংস্কৃতিক কর্মীরা সীমান্ত পেরিয়ে আসা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিম্নে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ও শরণার্থীদের সাহায্যে আসামের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের তালিকা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হল।

১) করিমগঞ্জ কলেজে আলোচনা সভা: একাত্তর সালের ২৬শে নভেম্বর করিমগঞ্জ ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাটির বিষয় ছিল 'বাংলাদেশ সমস্যা'। করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী রাকেশচন্দ্র রায় আলোচনা সভাটির সভাপতিত্ব করেছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কেতকী প্রসাদ দত্ত ও সহ-সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্যব্রত রায়ের ভাষণের পর বাংলাদেশের ছাত্র নেতা শ্রী খুরসেদ ইরন, রেজওয়ান উদ্দীন ও শ্রীমতী রেখা দাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ করে ভাষণ দিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশ বিষয়ে রচনা পাঠ করেছিল। উপাচার্য শ্রী শৈলেন শেখর দত্ত সহ কলেজের অমান্য শিক্ষকরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

২) বাংলাদেশের জন্য পথ-সংগীত: একাত্তর সালের জুন মাসে, শিলচরের কবি-সাহিত্যিকদের দ্বারা এপার ও ওপার বাংলার শিল্পীদের সাহায্যে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের গণ-সংগীত এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজন শিলচর শহরের জনসাধারনের মনে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। শিলচর শহরের রাস্তার উপর দিয়ে পথ চলতে চলতে এই ধরণের গণ-সংগীতের আয়োজন ছিল এই প্রথম। কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষে শ্রী কালীকুসুম চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য এটিকে একটি মাধ্যম মনে করেছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, পূর্ব-বাংলার শ্রী কনকশ্রী পাল, গৌরচাঁদ দাস, গৌতম দাস, ভারতের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত গণ-সংগীত শিল্পী শ্রী খালেক চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়। এই পথ সংগীতের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য শিলচরের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী কালীকুসুম চৌধুরী। হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রামলেন্দু চক্রবর্তী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।[৩]

৩) গীতিনাট্য নকসা: - শিলচরের টাউন হলে মহিলা সংস্থার উদ্যোগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি নীতিনাট্য নকসার আয়োজন করা হয়েছিল। নকসাটির নাম ছিল 'বিক্ষুব্ধ বাংলা' নকসাটি দর্শক মহলে প্রচুর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।[৪]

৪) শরণার্থীদের সাহায্যে নাট্যানুষ্ঠান:- ১৯৭১ সালের ৯ জুন 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে, শরণার্থীদের সাহায্যে হওয়া একটি নাট্যানুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। হাইলাকান্দি টাউন হলে পূর্ববঙ্গ ত্রাণ কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের পটভূমিকায় ' জয় বাংলা' নামক নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল। নাটকটি দর্শকদের প্রশংসাও লাভ করে। এই নাটকটি সম্পর্কে জানা যায়, মূলত রাজাকারদের করা অত্যাচার, লুণ্ঠন, গণহত্যা, ধর্ষন এবং দেশত্যাগের পটভূমিতে নাটকটির নির্মাণ হয়েছিল। মূলত শরণার্থীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটানো ছিল নাটকটি মঞ্চস্ত করার উদ্দেশ্য একাত্তর সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হাইলাকান্দি ই, এন্ড, সি অফিস প্রাঙ্গনেও নাটকটি মঞ্চস্ত হয়েছিল।[৫]

বাংলার মুক্তিযুদ্ধ আলোকময়: - শরণার্থীদের মনোবল বাড়াতে, ২১ ফেব্রুয়ারীর ভাষা আন্দোলন ও ১৯ মে'র বাংলা ভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ শহিদদের স্মৃতিকে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আলোকময় রচিত একাত্তর সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থটিতে বাংলাভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছিল।

বাংলাদেশ পত্রিকার উদ্যোগে প্রীতি সম্মেলন: সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার বিশেষ সংগ্রামী সংখ্যা সংকলন প্রকাশিত হত আসাম থেকে। একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে, আসামের গোপালগঞ্জের অস্থায়ী বাসভবনে আব্দুল মতিন চৌধুরী এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সাপ্তাহিত বাংলাদেশ পত্রিকা মূলত স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করত। সংগ্রামী সংকলন প্রকাশ উপলক্ষ্যে ডিসেম্বর মাসে গোপালগঞ্জে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাতে এই সম্মেলন উপলক্ষে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। শহরের বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বাংলাদেশ এর বিষয়ে আগ্রহী নাগরিকরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশিষ্ঠ আইনজীবি ব্যারিস্টার গোলাম ওসমানীর পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন, তার পটভূমি বর্তমান স্তর ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিতোষ পালচৌধুরী, অখিলবন্ধু চক্রবর্তী, আশিস দত্ত প্রমুখ। এই পত্রিকাটি প্রবীণ জননেতা, নন্দকিশোর সিংহের 'কো-অপারেটিভ প্রেস' থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হতো।[৬]

মুক্তিযুদ্ধ ও অরুণোদয় পত্রিকা: ১৯৫০ সালে সাপ্তাহিক 'অরুণোদয়' পত্রিকার পথ চলা শুরু সুনীল দত্তরায়ের সম্পাদনায়। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত নিয়মিত এই পত্রিকাটি চালু ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রথমেই 'অরুণোদয়' কার্যালয় মুক্তিফৌজ ও মুক্তিকামী বাংলাদেশের নাগরিগদের একটি তথ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে 'অরুণোদয়' পত্রিকার সম্পাদক সুনীল দত্তরায় ছিলেন বিশেষভাবে উৎসাহি। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন, অতীন দাশ। পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখতেন পরিতোষ পাল চৌধুরী, আশিস দত্ত।[৭]

বরাক উপত্যকার সহযোগী সংগঠক: - বরাক উপত্যকার অনেক সংগঠন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ঈমাদ উদ্দীন বুলবুল এর ভাষ্য মতে তাঁরা বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি গঠন করেছিলেন। সভাপতি শংকর রায় চৌধুরী শিলচর-২, সহ-সভাপতি মোঃ লুৎফুর রহমান জাটিঙ্গামুখ, সম্পাদক ইমান উদ্দীন বুলবুল কাটিগড়া, সহ-সম্পাদক আব্দুর রাকিম করিমগঞ্জ। জুলাই মাসে শিলচরের কাছাড় কলেজ থেকে প্রচার পত্র প্রকাশ পায়। "বাংলাদেশের জনগণকে আমরা কেন সাহায্য করিতেছি" বলে।[৮]

খালেক চৌধুরী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: খালেক চৌধুরী বরাক উপত্যকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বতভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। দিলীপকান্তি লস্কর তাঁর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খালেক চৌধুরীর অবদান ও সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ভূমিকা' প্রবন্ধে 'পড়শি' পত্রিকায় লিখেছেন—

> “মূলত করিমগঞ্জ ও শিলচরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাঁর সংগীতের মাধ্যমে বাঙালির একতা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের একত্র করে তুলতে পেরেছিলেন। গানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেশাত্মবোধের চেতনা রসে মজিয়ে কত কথা, কত গল্প বলে বলে আসর জমাতেন।”[৯]

করিমগঞ্জের অধিবাসী খালেক চৌধুরী ছিলেন গণ সঙ্গীত শিল্পী। খালেক চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কয়েকজন উৎসাহী ব্যাক্তিকে নিয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন। গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে, রিকশায় মাইক বেঁধে পথে হেঁটে গান গাইতেন। মলয়কান্তি দে, শ্যামল দে ছিলেন খালেক চৌধুরীর সঙ্গী। মলয়কান্তি দে জানান

> “পুরো গানের বিষয়টাকেই আমাদের অভিনব মনে হতো। শুনেছি আই সি টি-তে নাকি এমন গানের স্কোয়াড বার হতো। গানগুলো ছিল অন্য ধরণের আমি, চরবাজারের শ্যামল দের খালেক দা’র গানের দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। গানগুলোর মাধ্যমে মূলত শরণার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনা, সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করতাম আমরা। যে গানগুলো আমরা গাইতাম প্রায় প্রচলিত গান না, একটা গানের কথা আলাদা ভাবে মনে আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা গানটিকে সুর দিয়েছিলেন খালেক দা। আরেকটা গান ছিল, আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম চলছে। একবার মনে আছে শিলচর থেকে কবি কালীকুসুম চৌধুরী এসে সঙ্গী হয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মী সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন খালেক চৌধুরীর। ভারত-বাংলাদেশ শিল্পী সমন্বয়ে, নজরুল জয়ন্তী পালন হয়েছিল একাত্তর সালে। পাঁচমিশেলি গানের পরিবর্তে, একাত্তর সালের বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে গান ও কবিতা পাঠ নির্বাচন করা হয়।”[১০]

বাংলাদেশের তথা সিলেটের কবি দিলওয়ারের কয়েকটি কবিতায় সুর দিয়ে গেয়েছেন একাত্তর কেন্দ্রীক গান । খালেক চৌধুরী যেমন কবিতায় সুর দিয়েছেন তেমনি একাত্তরের বিষয় অবলম্বন করে গান ও লিখেছেন। তাঁর ভুলব না ভুলব না ভুলব না তোমাদের দান। ভেঙে ভয় বন্ধনে, অধিকার অর্জনে তোমরা দিলে প্রাণ গানটি বিখ্যাত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর, সিলেটের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে ১৯৭২ সালে উপস্থিত হয়েছিলেন খালেক চৌধুরী।

বরাকের কবিগানে মুক্তিযুদ্ধ: একাত্তর সালে বরাকের পল্লি কবি মোঃ আলাউদ্দিন খাঁ লিখেছিলেন ‘জয় বাংলার কবিতা’ মূলত মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশ ছেড়ে চলে আসা শরণার্থীদের জীবন, পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের উপর হওয়া অত্যাচারের দলিল হয়ে উঠেছে কবিগানগুলি। নিম্নে এমনই একটি কবিগানের থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হল। বরাকের কবিগান প্রথম খণ্ড থেকে কবিগানের অংশটির উদ্ধৃতি দেওয়া হল— ‘পল্লীবাসী লোক আমি ভাষা সাধারণ...আমি কি লিখিব ২ কি বলির জয় বাংলার কথা। কলমে না কালি চলে প্রাণে লাগে ব্যথা/ বড় দুঃখের কথা ২ কইতে হেতা চক্ষে আসে পাণী। রাজ্য জুড়িয়া মহামারী কভু নাহি শুনি/ মজিবুর রহমানে ২ ভাবে মনে প্রজাগণকে নিয়া (পূর্ব) পাকিস্তানের নাম জয় বাংলা বলিয়া/ মিস্টার ইয়াখাঁনে ২ নাহি মানে কি করি বয়ানে স্বাধীন বাংলা জয় ধ্বনি পূর্ব পাকিস্তান / হিন্দু মুসলিম যত ২ একমত দলবদ্ধ হইয়া। বিনা অস্ত্রে সংগ্রাম করে জয়বাংলা বলিয়া/...তখন ইয়াখাঁনে ২ নাহি মানে কি করে তখন, প্রজার উপর জুলুমজারী...বোমপাট করে ২ সহর বন্দরে গ্রামাঞ্চলে দিয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী অগ্নিতে জ্বলিয়া/ পুড়ে করল ছাই ২ শুনেন ভাই ঢাকার কাহিনি, বংশে বাতি জ্বালাইতে না রাখিল প্রাণী/ পরে কুমিলার ২ হায়রে হায় বেলা ২টার পরে। কেহ বসে খানা খেতে কেহ রান্না ঘরে/ হঠাৎ আওয়াজ হইল ১ বোমা পড়ল উপর থেকে ভাই। ৭০ হাজার নরনারী দেহে প্রাণ নাই/ কত মানুষ মরে ২ সহর বন্দরে যুগান্তরে পাই, এমন ঘটনা দেশে আর ঘটেনা ভাই/ যারা যারা জখম ছিল ২ কোথায় গেল না পাইলো খুজিয়া, মা জননী কোথায় গেল আধ মরা হইয়া/ হইল মরুভূমি ২ মাটির জমি পুড়ে হইল ছাই, মরা মৎস্য জলে ভাসে বাঁচবার সাধ্য নাই/ মানুষ মরে কত ২ অবিরত নিউজে খবর। আড়াই লক্ষ মানুষ মরে ঢাকার সহর/ কত স্থানে স্থানে ২ পাঠান সৈন্য গুলা বারুদ দিয়া। বাস্ত হারা করে দিল ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া/ কত জিলায় জিলায় ২ হায়রে হায় বোমা নিক্ষেপ করে। জ্বলে পুড়ে মানুষ মরে হাজারে হাজারে/ রংপুর টাউনেতে ২ পাই জানিতে গুলা বর্ষণ হয়। মানুশ-গরু শিয়াল কুকুর কিছু নাহি রয়/ এরুপ উত্তেজনা ২ আর সহেনা পাইয়া কোন বিচার। চতুরদিকে বোমার গ্যাসে হইল অন্ধকার/ একি মহামারী ২ অবিচার রাজ্য

শাসন করে। মানুষ মারি রাজ্য শাসন কোন বিধানে ধরে/...বর্ডার খোলা ছিল ২ লোক আসিল লক্ষ লক্ষ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিয়াছেন আশ্রয়/ কত অফিস ঘরে ২ লোকনা ধরে হাইস্কুলে কত। আসাম প্রদেশ ১২ জিলায় ৮/১০ লাখের মত/...কবি হয় ক্রমশ এই পর্যন্ত সবাকে জানাই। বাকি কথা দ্বিতীয় সংখ্যায় দেব যে পুরাই/ কবি শেষ হইল ২ বাকী রইল কবিতার দাম। মূল্য মাত্র ২০ পয়সা সবায় জানাইলাম/ কবি শেষ হইল।[১১]

শুধু কবিগান নয়, খবরের কাগজগুলিতে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বেশকিছু স্মৃতিলেখ্য এবং কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধরণের কাব্য সৃষ্টিগুলির উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলা সম্পর্কিত খবরাখবর গুলিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় মহানন্দ লিখেছেন 'ইয়াহিয়া হুঁসিয়ার' কবিতাটি— রক্তলোলুপ হইয়া খান হও হুঁসিয়ার/ হানা দিয়ে তুমি ভেবেছ কি মনে আমরা মানিব হার?/ কামান বন্দুক শত থাক তব ভারতের লোক জানে/ স্বদেশের মান রাখতেই হবে কোন বাধা নাহি মানে/ তুমি কি ভেবেছ দস্যু দানব ভারত করিবে গ্রাস?/ বাংলা দেশকে শ্মশান করেও মেটেনি তোমার আশ/ যারা দেয় তব শক্তি জুগিয়ে তারাও একথা জানে/ স্বাধীন ভারত উঠিবে জাগিয়া সকল শক্তি দানে/ হানাদার তুমি পাইবে শাস্তি যোগা যাহা তোমার/ ভারতের বীর সেনানীরা আজ উঠছে জেগে আবার/ তুমি কি জাননা ইয়াহিয়া খান, ভারতের নরনারী/ শত্রু দমন করিবার তরে তুলিবেই তরবারী/ হোকনা তোমার বিদেশী অস্ত্র দেখি কত আছে বল/ আমরা দাঁড়াব এক হয়ে সবে ভেবনাক দুর্বল...।[১২]

কবি, সাংস্কৃতিক কর্মীরা মূলত আগত শরণার্থীদের প্রত্যক্ষ বর্ণনা থেকেই কাব্য সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। একাত্তর সালের প্রথম পর্ব পর্যন্ত, সাহিত্যিকদের কাব্যের বিবরণ জুড়ে ছিল মূলত, পূর্ব-পাকিস্তানে হওয়া বাঙালির প্রতি অত্যাচার, গণহত্যার চিত্র। ১৯৭১ সালের ১২ই মে 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আলোকময় এর 'বাঙ্গালীর পরাজয় নাই' শীর্ষক কবিতাটি। কবিতাটি নিম্নরূপ—

'থামাও অশ্ব' কহে পাঠান জল্লাদ/ 'অসম্ভব' হুংকার মুক্তিকামী/ 'মৃত্যু ঘণায়ে এলে আগুন শিলায়/ নাই পরোয়া/ পৌঁছে গেছি লক্ষ্যে সুনিশ্চয়/ মুক্তি পিপাসুপ্রাণ/ চেনে না পরাজয়/ জল্লাদের শানানো কৃপাণ/ শিশু-নারী নির্বিচারে/ কচুকাটা করে/ বোবা কেন বিশ্বের বিবেক? / 'পুড়ছে পুড়ুক'/ চির বিপ্লবের পীঠ বঙ্গভূমি? / আগুন আহুতি দিলে ঘৃত/ দাবানলে ছিটালে পেট্রোল/ আলেয়ার বশালে দমকল/ নিভেনা আগুন:/ হয়ে উঠে অজর অমর।/ বঙ্গদেশ, বাঙ্গালীর পরাজয় নাই/ শ্মশানে যতোই বাড়ুক বাঙ্গালীর চাই।[১৩]

এগুলি ছাড়াও পরিতোষ পাল রায়চৌধুরী নিয়মিত রিপোর্তাজধর্মী লেখা লিখতেন। শরণার্থী সমস্যা, পূর্ব-পাকিস্তানে সংগঠিত অত্যাচারের কাহিনি, যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বর্ণনা থাকত তাতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে একাত্তর সালে শিলচরে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার কথাও জানা যায়। যদিও নাটক দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। শিলচরের প্রখ্যাত কবি অতীন দাশ সেই সময় পর্বে বিক্ষিপ্ত কিছু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক সাহায্যের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজ উদ্যোগে শরণার্থীদের সাহায্য করে দিয়েছেন মানবিকতার পরিচয়।

তথ্যসূত্র:

১. মামুন, মুনতাসীর, একাত্তরের বন্ধু যারা, অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০২২
২. মামুন, মুনতাসীর, মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ, মাওলা ব্রাদার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০২১
৩. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ ১৯৭১
৪. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ, ১৯৭১, ১২ সেপ্টেম্বর,পৃ-২
৫. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ২৪ বর্ষ, ১৯৭১, ৯ জুন, পৃ-২
৬. যুগশঙ্খ, ১৯৭১, শিলচর, আসাম
৭. দাশ, অতীন, আসাম, শিলচর, ২৫.০৭.২৩
৮. বুলবুল, ঈমাদ উদ্দীন, আসাম, শিলচর, ২৯.০৭.২৩

৯. নস্কর, দিলীপ কান্তি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে খালেক চৌধুরীর অবদান ও সীমান্ত শহর করিমগঞ্জের ভূমিকা, পড়শি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা, কলকাতা, প্রকাশ – শরৎ - ২০২৩, পৃ-৩২৮

১০. দে, মলয় কান্তি, শিলচর আসাম, ২৬.০৭.২৩

১১. বরাকের কবিগান (প্রথমখণ্ড), সম্পাদক – মজুমদার আবিদ রাজা জয় বাংলার কবিতা, পলি কবি মোঃ আলাউদ্দিন খাঁ, নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ – জুন, ২০১৭পৃ-২৬৮-২৬৯

১২. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ১৯৭১

১৩. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক- চৌধুরী শক্তিধর, হাইলাকান্দি, ১৯৭১, ১২ মে, পৃ-৩